ফিদায়ী হামলা – আত্মহত্যা নাকি শাহাদাতবরণ?

দৃষ্টি আকর্ষণ

(সম্প্রতি কতিপয় উলামায়ে সূ ও কিছু নামধারী সালাফী আলেম এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে অন্যান্য মন্ত্রী-এমপিরা, তথাকথিত সুশীল নামধারী বুদ্ধিজীবিরা, রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা, রাজনীতিবিদরা ও হলুদ মিডিয়ার সাংবাদিকরা ফিদায়ী হামলা নিয়ে বিষোদগার ও সমালোচনা এবং প্রোপাগান্ডা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। তারা বলছে: ইসলামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নাই। যারা তা করে তারা ধর্মান্ধ,মৌলবাদী, উগ্রবাদী,বর্বর, চরমপন্থী ও জঙ্গিবাদী প্রভৃতি। এতে সাধারণ জনগণ বিভ্রান্ত হচ্ছেন...সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো সাধারণ জনগণ ও দ্বীনি ভাইদের সামনে ইসলামের সঠিক মাসআলাটি উপস্থাপন করা। (যদিও এই বিষয়ে আরো অনেক আগেই শহীদ, আল-হাফিজ, মুজাহিদ শাইখ ইউসূফ ইবনে সালেহ আল-উয়াইরী রহ,এর 'ফিদায়ী অভিযানের' বিষয়ে ইসলামের বিধান, এটা আত্মহত্যা নাকি শাহাদাতবরণ? এই নামে আল-ফজর মিডিয়া থেকে একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল।) এ অনুভূতির তাগিদ থেকেই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটি কিছুটা সম্পাদনাসহ সংগ্রহ করে উপস্থাপন করা হলো। তবে এই প্রবন্ধ লেখকের নাম জানা সম্ভব হয়নি। আল্লাহ তা'আলা লেখককে জাযায়ে খাইর দান করুন এবং একে আমাদের জন্য উপকারী হিসাবে কবুল করুন।... আমীন)

{ইসলামে ফিদায়ী হামলা তথা "শহীদি অভিযান" বৈধ। কারণ এতে নিজের জীবন উৎসর্গ করা হয়, আল্লাহর কালিমাকে সুউচ্চ করার জন্য, তাঁর দ্বীন প্রসারের জন্য, তাঁর শত্রুদের আতংকিত করার জন্য এবং তাঁর বান্দাদের (মুসলিমদের) লড়াইয়ের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য...!}

{শহীদি অভিযানের বিরুদ্ধে সকল রকম মিথ্যা প্রচারণা আসলে একটি প্রহসন। কারণ এর যৌক্তিকতা শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত। পৃথিবীর মুসলিমদের মিডিয়া বা জনমতের দিকে তাকানো উচিৎ নয়, বরং কোন কাজের যৌক্তিকতার মানদণ্ড নির্বাচন করতে তাকাবে শরীয়তের দিকে– আলোক উজ্জ্বল, সুস্পষ্ট শরীয়ত, যা তাদের ইহকাল ও পরকালের মুক্তির আলো ধারণ করে থাকে।}

****

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলার জন্য ... যিনি আসমান ও জমিন ও এর মধ্যবর্তী সবকিছুর প্রতিপালক। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন, তাঁর সাহাবীগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী তাঁর সমস্ত অনুসারীদের উপর। যখন থেকে বিংশ শতাব্দীর শেষাংশ ও একবিংশ শতাব্দীর ইসলাম ও কুফরের মধ্যকার যুদ্ধ শুরু হয়েছে, তখন থেকে বৈশ্বিক পরিসরে কিছু পরিভাষা নির্বিকারচিত্তে ও যাচাই-বাছাই বিহীনভাবে গৃহীত হয়ে এসেছে। এই পরিভাষাগুলোর মধ্যে একটি হলো: "আত্মঘাতী

বোমা-হামলা", যা সমসাময়িক বিশ্বমিডিয়াগুলোতে মুজাহিদীনের বীরত্বপূর্ণ অভিযানগুলোকে বর্ণনা করতে বহুল ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

নিঃসন্দেহে এটি একটি যুদ্ধ কৌশল, যা কাফিরদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে চলেছে। বাস্তবিক দৃষ্টিকোণ থেকে কাফিররা এই যুদ্ধকৌশলের জবাব দানে অসমর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। এজন্যই এর বিরুদ্ধে তাদের একমাত্র অস্ত্র হল: তাদের মিডিয়াগুলিকে ব্যবহার করে, সত্যকে জনগণের চোখে বিকৃতভাবে প্রকাশ করা।

ইহুদী চেরিল বার্ণার্ড তার ঘৃণ্য (RAND) গবেষণাপত্র "সুশীল উদার গণতান্ত্রিক ইসলাম" নামক বইয়ে বৈশ্বিক জিহাদের ডাককে ব্যর্থ করার জন্য পদক্ষেপগুলির মধ্যে একটি উল্লেখ করেছে এই যে, "মৌলবাদী চরমপন্থি ও সন্ত্রাসীদের উগ্র কর্মকাণ্ডগুলোর প্রতি কোনরকম উচ্চ ধারণা বা মুগ্ধতা প্রকাশ করা যাবে না। তাদেরকে অস্থিতিশীল প্রকৃতির এবং কাপুরুষ হিসেবে দেখাতে হবে, মন্দ স্বভাবের বীরপুরুষ হিসেবে নয়। এই আদর্শগত নীতির উপর ভিত্তি করেই তারা মুজাহিদীনের কৃতিত্ব প্রকাশ করে থাকে, কাজেই এই নীতির উপর ভিত্তি করে যা জানা যায়, তা কখনোই বাস্তব প্রকৃত সত্য অনুধাবনের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে না। তাই "আত্মঘাতী বোমা-হামলা" ("শহীদি অভিযান") আসলে কী? তা বোঝার জন্য আমাদের প্রয়োজন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ একটি গবেষণাপত্র। যাদের বিবেক ও অন্তর এ ব্যাপারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে, তাদেরকে সুস্থ করার উদ্দেশ্যে; এক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব কুরআনের চিকিৎসা, সুন্নাহ এর ঔষধ এবং স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধির সঞ্জীবনী শক্তি, ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই সরল পথের দিকে একমাত্র হেদায়াতদানকারী।

আত্মঘাতী বোমা-হামলা কী?

"সংজ্ঞাভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে "আত্মঘাতী বোমা-হামলা" হল- যখন একজন ব্যক্তি বা একটি দল তার/তাদের লক্ষ্যবস্তুকে একটি যুদ্ধসংশ্লিষ্ট অভিযানে ক্ষতিগ্রস্থ করার উদ্দেশ্যে নিজের/নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে দেন।" এর পদ্ধতি হতে পারে নিজের দেহের সাথে বিস্ফোরক বেধে নেয়া, অথবা দেহসংযুক্ত কোন যন্ত্রপাতির সাথে অথবা যান-বাহনের সাথে, এরপর লক্ষ্যবস্তুকে ক্ষতিগ্রস্থ করার জন্য সুবিধাজনক স্থানে বিস্ফোরণ ঘটানো। এই অভিযানগুলোতে যে ব্যক্তি বিস্ফোরণের দায়ভার গ্রহন করেন, সে মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই জীবন হারায়, তাই এটাকে বলা হয়ে থাকে "আত্মঘাতী হামলা"।

এই যুদ্ধকৌশলটি কোন অভাবনীয়, নব-আবিষ্কৃত বর্তমান সময়ের কোন কৌশল নয়, বরং ইতিহাসে বিভিন্ন জাতির দ্বারা বিভিন্নভাবে এই কৌশলটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। উদাহরণ হিসেবে, আধুনিক যুগে, ৯/১১ এবং ৭/৭- এর বিখ্যাত "আত্মঘাতী" অভিযানগুলো মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে(যেমনটা বলা হয়ে থাকে), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানীরা যুদ্ধ কৌশলের অংশ হিসেবে "কামিকাজি" (kamikaze) "আত্মঘাতী বোমা হামলা" পরিচালনা করেছে। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে পোলিশ আর্মি "আত্মঘাতী বোমা-হামলা" ব্যবহার করেছে বলে জানা গেছে। সাধারণত: আত্মহত্যা পরিভাষাটির ব্যবহার হয়ে থাকে, যখন একজন ব্যক্তি অশান্তি/অতৃপ্তি, একাকীত্ব অথবা এরকম অন্য কোন কারণে নিজের জীবনাবসান ঘটান। আত্মহত্যাকে সাধারণত: নিন্দনীয় দৃষ্টিতে দেখা হয়ে থাকে। কিন্তু ইসলাম আমাদেরকে শেখায় আত্মহত্যা তখন সংঘটিত হয়, যখন মানুষ আল্লাহর আদেশ-নিষেধ থেকে দূরে সরে যায় এবং আল্লাহর সাথে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন-

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ (طه: ١٢٤)

অনুবাদ: "এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।" (সূরা ত্বহা-১২৪)

কাজেই যে কেউই আল্লাহর দ্বীন থেকে, তাঁর কুরআন এবং তাঁর নবীর শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জন্য থাকবে এক কঠিন জীবন, এটা তার বোধগম্য হোক বা না হোক। যখন একজন মুশরিক বা কাফির; যে আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করে না, অথবা তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে, ফলশ্রুতিতে সে আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীন হয়ে যায়, এমনিভাবে যখন তার গুনাহের প্রতিদানস্বরূপ বা অন্য কারণে কোন বিপদ-আপদ তার জীবনে আসে অথবা এই পৃথিবীতে তার যাওয়ার মত কোন জায়গা খুঁজে না পায় এবং সে এই জীবনের কোন অর্থ খুঁজে পায় না.. ঠিক তখনই সে আত্মহত্যা করে। আর যখন একজন মুসলিম আত্মহত্যা করে, তখন এর কারণ থাকে অনেকটা একই রকম। তা হলো: আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরে অসন্তুষ্টি ও দুর্বল ঈমান।

ইসলামে আত্মহত্যার বিধান

শায়খ আবদুল হাকীম (হাফিযাহুল্লাহ) লিখেছেন:

“আল্লাহর লানত আত্মহত্যাকারীর উপর। তার বাসস্থান জাহান্নামের আগুন। আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট। যে আত্মহত্যা করে সে এটা করে ধৈর্যহীনতা এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে। হয়ত তার ঈমানে ঘাটতি আছে, অথবা তার ঈমান-ই নেই। সে এমন কারণে নিজেকে হত্যা করে, যে কারণে নিজের জীবন বিনষ্ট করার অনুমোদন শরীয়তে নেই। উদাহরণস্বরূপ ক্রোধ, অসুস্থতা অথবা সম্ভ্রমহানি। এগুলোর কোনটার সাথেই আল্লাহর কালিমাকে সুউচ্চ করার কোন সম্পর্ক নেই।”

হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. বলেছেন, “আমরা যখন খায়বারে ছিলাম, তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন লোকের ব্যাপারে বলেছিলেন যে, সে একজন জাহান্নামী, যদিও সেই লোকটি নিজেকে মুসলিম দাবি করত। যখন যুদ্ধের সময় আসল, সে বীরত্বের সাথেই লড়াই করল। অতঃপর যখন সে খুব মারাত্মক ধরনের ক্ষত-বিক্ষত হল, মানুষজন তার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা শুরু করল (তার তাকদীর সম্পর্কে)। (কিন্তু) যখন তার ক্ষতে অসহনীয় যন্ত্রণা আরম্ভ হল, তখন সে নিজের তূণীর থেকে একটি তীর বের করে সেটা দিয়ে আত্মহত্যা করল। মুসলিমদের জন্য এটা খুব কষ্টকর বিষয় ছিল। তারা বলল, “হে আল্লাহর রাসূল, আপনার কথাই সত্য প্রমাণিত হল। সেই লোকটি আত্মহত্যা করেছে।” তিনি বললেন, “ঘোষণা করে দাও, শুধুমাত্র মু’মিনরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা ফাসিক ব্যক্তি দ্বারাও এই দ্বীনের সাহায্য নিয়ে থাকেন।” (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ)

হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যে কেউ নিজেকে শ্বাসরোধ করে আত্মহত্যা করবে, তাকে জাহান্নামের অগ্নিতে শ্বাসরোধ করা হবে। যে তরবারি বা ছোরা দিয়ে আত্মহত্যা করবে, তাকে জাহান্নামের অগ্নিতে সেই একই শাস্তি দেয়া হবে।”

এই ব্যাপারে অনেক হাদীস আছে। আত্মহত্যার নিষেধাজ্ঞার উপর আলেমদের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আত্মহত্যাকারী কবীরা গুনাহতে লিপ্ত হয়েছে। যদি সে এটাকে জায়েজ মনে করে, তাহলে সে চিরকালের জন্য জাহান্নামের অগ্নিতে থাকবে। আর যদি সে এটাকে নাজায়েজ বলে জানে, তাহলে সে দীর্ঘ সময়ের জন্য জাহান্নামে থাকবে, কিন্তু চিরকালের জন্য নয়।

আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩) وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (النساء: ٣٠)

অনুবাদ: “...আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা’আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু।। আর যে কেউ সীমালঙ্ঘন কিংবা জুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে, তাকে খুব শীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজসাধ্য।” (সূরা নিসা: ২৯-৩০)

উপরের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, আত্মহত্যা করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এর বিপরীতে যা দেখা যাবে তা হল, “আত্মঘাতী বোমা-হামলা” ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মহত্যা নয়। কারণ, আমরা দেখব যে, ইসলামে শহীদি অভিযানের প্রশংসা করা হয়েছে। কাজেই শহীদি অভিযান খ্যাত ‘আত্মঘাতী বোমা-হামলা’কে এখন থেকে আমরা “আত্মঘাতী বোমা-হামলা” না বলে “শহীদি অভিযান” পরিভাষাটি ব্যবহার করবো।

শহীদি অভিযানের ব্যাপারে ইসলামের নীতি

কুরআন, সুন্নাহ এবং হক্কানী আলেম-উলামাদের অনেক বক্তব্য থেকে শহীদি অভিযানের সমর্থন পাওয়া যায়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (البقرة: ٢٠٧)

অনুবাদ: “আর মানুষের মাঝে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজেদের জানের বাজি রাখে। আল্লাহ হলেন তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান।” (সূরা বাকারাহ-২০৭)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মত এই যে, আয়াতটি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী প্রতিটি মুজাহিদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে ... আর যখন হিশাম ইবনু ‘আমির শত্রুদলের মাঝে ঝাপিয়ে পড়লেন, সে সময় কিছু লোক এ ব্যাপারে আপত্তি করল। তখন উমর বিন খাত্তাব এবং আবূ হুরায়রা রাযি. এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।” (তাফসীর ইবনে কাসীর ১/২১৬)

হিশাম ইবনু ‘আমির যখন শত্রুদলের মাঝে ঝাপ দিয়েছিলেন, তখন এর ফলাফল সম্পর্কে পুরোপুরিই জানতেন যে, প্রায় নিশ্চিতভাবেই তিনি নিহত হবেন, ঠিক যেমনটা শহীদি অভিযানে হয়ে থাকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, উমর বিন খাত্তাব এবং আবূ হুরায়রা রাযি. এ কাজটি সমর্থন করেছিলেন।

ইমাম মুসলিম রহ. তাঁর সহীহ মুসলিমে সহীহ সনদে হযরত আবূ বকর বিন মূসা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "আমি আবূ হুরায়রা রাযি.কে শত্রুর উপস্থিতিতে এ কথা বলতে শুনেছি যে, 'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতের দরজা তরবারির ছায়াতলে!' তখন একজন শক্তি-সামর্থসম্পন্ন লোক উঠে দাঁড়াল এবং বলল, 'হে আবূ মূসা! আপনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই কথা বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তখন লোকটি নিজের সাথীদের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, 'তোমাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে সালাম।' তারপর নিজের তরবারির খাপটি ভেঙ্গে ফেলল এবং শত্রুর দিকে খোলা তরবারি নিয়ে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকল।"

বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে ইমাম মুসলিম রহ. তাঁর কিতাবে একটি সহীহ হাদীস উল্লেখ করেছেন: আনাস ইবনে মালিক রাযি. হতে বর্ণিত "মুশরিকরা (এখন আমাদের দিকে) এগিয়ে আসল, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "উঠ এবং জান্নাতে প্রবেশ কর, যার প্রস্থ আসমান ও যমিনের সমান।" উমাইর বিন আল-হুমাম আল-আনসারী রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাত কি আসমান ও যমিনের সমান? তিনি বললেন, "হ্যাঁ"। উমাইর বললেনঃ "ভাল, ভাল!" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কিসে তোমাকে এই শব্দগুলো উচ্চারণ করতে উদ্বুদ্ধ করল? (অর্থাৎ "ভাল, ভাল!")" তিনি (উমাইর) বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! অন্য কিছু নয় বরং এই ইচ্ছা যে, আমি যেন তার (জান্নাতের) অধিবাসীদের একজন হতে পারি।" তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তুমি (নিশ্চয়ই) তাদের একজন।" এরপর উমাইর রাযি. নিজের থলি হতে কিছু খেজুর বের করে খেতে লাগলেন। এরপর বললেন, "যদি এই সবগুলি খেজুর খাওয়া পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকি তবে তা হবে একটি দীর্ঘ জীবন।" (বর্ণনাকারী বলেন): "সে তাঁর সাথে যত খেজুর ছিল সব ফেলে দিল এবং শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে করতে নিহত হয়ে গেল।"(সুবহানাল্লাহ!!)

উপরের দু'টো বর্ণনাতেই আমরা দেখলাম যে, সাহাবীরা আক্রমন পরিচালনা করেছেন, তারা প্রায় নিশ্চিতভাবেই জানতেন যে, এ অভিযানে তারা নিহত হবেন, কিন্তু এরপরও তারা আক্রমন পরিচালনা করেছেন এবং তাদের এই কাজগুলো শরীয়াহ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে।

মুসতাদরাকে হাকিম গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, একলোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আসলেন এবং বললেন, "আপনি কি বলেন, যদি আমি নিজেকে মুশরিকদের মাঝে নিক্ষেপ

করি এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাদের সাথে লড়তে থাকি? আমি কি জান্নাতে যাব?” তিনি বললেন, “হ্যাঁ”।” অতঃপর লোকটি নিজেকে মুশরিকদের মাঝে নিক্ষেপ করল এবং লড়াই করতে করতে নিহত হয়ে গেল।

এই হাদীসটিও শহীদি অভিযানের পক্ষে একটি সুস্পষ্ট দলীল, যাতে শত্রুদলের ক্ষতি করার জন্য নিজেকে তাদের মাঝে নিক্ষেপ করা বৈধ বলে প্রমাণিত হয়।

ইমাম আহমাদ রহ. তার মুসনাদে আহমাদে, ইবনে মাসঊদ রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আমাদের রব্ব দু’জন ব্যক্তির ব্যাপারে বিস্মিত হন। একজন হলেন: যে নিজের বিছানা ছাড়ে নামাযের জন্য। আরেকজন হলেন: যে আল্লাহর রাস্তায় অভিযান চালায় এবং এতে তার সঙ্গী-সাথীরা পরাস্ত হয়েছে, আর সে বুঝতে পারে পরাজয়ে তাঁর জন্য কি অপেক্ষা করছে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে গেলে তাঁর জন্য কি অপেক্ষা করছে। কিন্তু সে (যুদ্ধক্ষেত্রে) ফিরে যায় যতক্ষণ না তার রক্ত প্রবাহিত হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “আমার বান্দাকে দেখ! সে (যুদ্ধে) ফিরে গেল, আমার কাছে যা আছে সে ব্যাপারে আশা ও ভয় রেখে, যতক্ষণ না তার রক্ত প্রবাহিত হল।” যে ব্যক্তিটি যুদ্ধে ফিরে যায় সে সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবে জানে যে, সে ফিরে গেলে নিহত হবে, কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা তাঁর আমলকে স্বাগত জানান এবং তাঁর কাজের প্রশংসা করেন। (সুবহানাল্লাহ!!)

মুয়া’জ ইবনে ‘আফরা রাযি. আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, “কি করলে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে হাসেন?” তিনি বললেন, “বান্দা নিজেকে বর্ম ব্যতিতই শত্রুদলের মাঝে নিমগ্ন করা।” মুয়া’জ তখন নিজের বর্ম খুলে ফেললেন এবং নিহত হওয়া পর্যন্ত শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকলেন।

সুবহানাল্লাহ!! যার ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা হাসেন তাঁর মর্যাদা কোন স্তরের?!

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেছেন, “যখন মুসলিমদের সেনাদল পারস্যবাসীদের মুখোমুখি হল, তখন মুসলিমদের ঘোড়াগুলো পারস্যবাসীদের হাতিগুলো দেখে ভয়ে পলায়ন করছিল। মুসলিমদের একজন কাদা দিয়ে একটি হাতি তৈরি করলেন এবং তাঁর ঘোড়াকে এটার সাথে অভ্যস্ত করে তুললেন (যাতে নতুন একটি প্রাণী দেখে ঘোড়াটি ভয় পেয়ে না যায়)। পরের দিন, তাঁর ঘোড়া হাতি দেখে পলায়ন করল না, তাই তিনি নেতৃত্বদানকারী হাতিটিকে আক্রমণ করলেন। তাকে বলা হয়েছিল, “এটি

নিশ্চিতভাবেই তোমার মৃত্যুর কারণ হবে।” তিনি বলেছিলেন, “এতে দুঃখের কিছু নেই, যে আমি মারা যাব আর মুসলিমরা বিজয়ী হবে।” (আল্লাহু আকবার!!!)

উল্লেখিত হাদীস ও ঘটনাগুলো ছাড়াও এর মত আরো অনেক হাদীস এবং ঘটনা বর্ণিত আছে। যেগুলোর দ্বারা এটা একবারেই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে, এই নিশ্চিত জ্ঞানের সাথে যে, এই আক্রমণ তাঁর মৃত্যুর কারণ হবে, ঠিক যেভাবে শহীদি অভিযানে করা হয়ে থাকে, আর এর দ্বারা ইসলাম এবং মুসলিমদের জন্য উল্লেখযোগ্য ধরনের উপকার থাকে, তাহলে শরীয়তে তার এই কাজ বিশাল পুরষ্কারের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। **“শহীদি অভিযান” এমন একটি কৌশল, যা পূর্বযুগে সাহাবীরা নিজেকে শত্রুদলের মাঝে নিক্ষেপ করার ন্যায়, যেখানে মৃত্যুর সম্ভাবনা নিশ্চিত। (সুতরাং তাদের (সাহাবীদের) কাজটি জায়েজ হলে, প্রশংসিত হলে এটা হবে না কেন?! অবশ্যই তা জায়েজ ও প্রশংসিত কাজ হবে।)**

তবে এখানে একমাত্র পার্থক্য হলো: শহীদি অভিযানে, একজন মুজাহিদ নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ, আর পূর্বে উল্লেখিত ঘটনাগুলোতে মুজাহিদীনের মৃত্যুর কারণ শত্রু। কিন্তু আলেমরা উল্লেখ করেছেন যে, এই পার্থক্য ধর্তব্য নয়, কারণ এখানে নিয়্যত (আল্লাহর কালিমাকে সুউচ্চ করা) এবং শেষ ফলাফল (মৃত্যু) দুটির ক্ষেত্র একই। তাছাড়া নিয়্যত-ই তো হল মূলত: গুরুত্বপূর্ণ ও মূল বিষয়। (যার ভিত্তিতে আখেরাতে ফায়সালা হবে)

এছাড়াও নিচের দলীল এ ব্যাপারে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে, আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার সবচাইতে শক্তিশালী দলীল হল গুহার বালক এবং আসহাবে উখদূদের ঘটনা। ঘটনাটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে পুরো ঘটনাটি পাওয়া যাবে। আমরা আমাদের আলোচনার সাথে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু এখানে উল্লেখ করব।

ঘটনার সারাংশ: পূর্বের জাতিগুলোর মধ্যে একটিতে, একজন রাজা এক বালককে তার ঈমান আনয়নের কারণে শাস্তি প্রদান করছিল। সে (রাজা) বালকটিকে বিভিন্ন উপায়ে মারার চেষ্টা করে, যেমন পাহাড়ের চূড়া থেকে ফেলে দেয়া বা সমুদ্রে ডুবিয়ে মারা ... কিন্তু বালকটি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে দু'আ করতে থাকে এবং বেঁচে যায়। বর্ণনা অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত যা ঘটেঃ “... সে (বালকটি) রাজাকে বললঃ “যতক্ষণ তুমি আমার কথামত কাজ না কর, আমাকে মারতে পারবে না!” রাজা বললঃ “সেটা কি?” সে উত্তর দিল, “সমস্ত লোকজনকে একটি সমতল ভূমিতে জমায়েত কর, আর আমাকে একটি (গাছের) গুঁড়ির সাথে বাধ। তারপর আমার তূণীর থেকে একটি তীর নিয়ে

ধনুকের মধ্যখানে রাখ এবং বল, ‘বালকটির রব্ব, আল্লাহর নামে!’ এরপর আমাকে তীর মার। যদি তুমি এটা কর, তাহলে আমাকে মেরে ফেলবে (মারতে সক্ষম হবে)।” বালকের কথা অনুযায়ী রাজা সমস্ত লোকজনকে একটি সমতল ভূমিতে একত্র করলেন এবং বালকটিকে একটি (গাছের) গুঁড়ির সাথে বাধলেন। এরপর তূণীর থেকে একটি তীর নিয়ে, ধনুকের মধ্যখানে বসালেন এবং বললেন, “বালকটির রব্ব আল্লাহর নামে!” বলে তীর নিক্ষেপ করলেন। তূনীর বালকটির কপালের পাশে আঘাত করল। সে নিজের কপালের পাশে হাত রাখল এবং মৃত্যুবরণ করল। অন্যদিকে লোকজন বলে উঠল, “আমরা বালকটির রব্বের উপর ঈমান আনলাম... আমরা বালকটির রব্বের উপর ঈমান আনলাম, তখন রাজাকে বলা হল, “তুমি কি দেখছ! যা তুমি ভয় করেছিলে? আল্লাহর কসম! যা তুমি ভয় করেছিলে তাই ঘটেছে! লোকেরা ঈমান এনে ফেলেছে (বালকটির রব্বের উপর)।” তখন রাজা প্রতিটি রাস্তার সন্ধিস্থলে পরিখা খননের আদেশ দিলেন। পরিখা খনন করার পর সেগুলোতে আগুন জ্বালানো হল, এরপর রাজা ঘোষণা করলেন, “যে কেউ নিজের ধর্ম ত্যাগে সম্মত হবে না, তাকে আগুনে ফেলে দাও বা আগুনে ঝাঁপ দিতে বল।” ঘটনাটি এরকমই ঘটেছিল, শেষ পর্যন্ত এক মহিলা নিজের সন্তানকে নিয়ে আগুনে ঝাঁপ দেয়ার ব্যাপারে দ্বিধাবোধ করলেন, তাঁর বাচ্চাটি এমতাবস্থায় বলে উঠল, **“হে আমার মা! ধৈর্যধারণ ধরুন, কারণ আপনি সত্যের উপর আছেন!”** (আল্লাহু আকবার!!!)

হাদীসটি থেকে এটা পরিষ্কার যে, বালকটি নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ ঘটিয়েছিল। যাতে মানুষেরা ইসলাম গ্রহন করে এবং জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে যায়। আর তাই, এরকম একটি আমল শরীয়ত অনুযায়ী আত্মহত্যা নয়। বরং, এটা সবচাইতে প্রশংসিত আমলগুলোর মাঝে অন্যতম একটি আমল। এখানে এটাও প্রমাণিত হল যে, ঠিক যেমন বালকটি ইসলামের জন্যে নিজের মৃত্যুর কারণ ঘটালো, শহীদি অভিযান পরিচালকের জন্যেও নিজের মৃত্যু নিজেই ঘটানো বৈধ, যদি এতে ইসলামের উল্লেখযোগ্য উপকারিতা থাকে (যা আলেম ও মুজাহিদরা নির্ণয় করবেন)। যদি কেউ দাবি করতে চায় যে, বালকটি নিজের হাতে নিজের মৃত্যু ঘটায়নি, সেক্ষেত্রে আলেমরা উল্লেখ করেছেন যে, একজন আত্মহত্যাকারী সে নিজেই নিজেকে হত্যা করুক বা অন্য কাউকে দিয়ে নিজেকে গুলি করাক, তার উপর একই হুকুম বর্তায়। তাই, হত্যার ধরন ধর্তব্য নয়, বরং আত্মহত্যার ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর গুরুত্বপূর্ণ)। একইভাবে শাহাদাত সন্ধানকারীর ক্ষেত্রে এটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, সে নিজের হাতে নিজেকে হত্যা করেছে নাকি শত্রুর হাতে মরেছে? যতক্ষণ তার নিয়্যত সহীহ থাকে অর্থাৎ

আল্লাহর কালিমাকে সুউচ্চ করা এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা, কাফিরদেরকে আতংকিত করা ইত্যাদি, আল্লাহ তা'আলাই সর্বাপেক্ষা জ্ঞাত। **এজন্যই "শহীদি অভিযান" বৈধ। কারণ এতে নিজের জীবন উৎসর্গ করা হয়, আল্লাহর কালিমাকে সুউচ্চ করার জন্য, তাঁর দ্বীন প্রসারের জন্য, তাঁর শত্রুদের আতংকিত করার জন্য এবং তাঁর বান্দাদের (মুসলিমদের) লড়াইয়ের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য...!**

আলেম/ইমামদের ফতোয়া

হানাফী মাযহাবের ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ-শায়বানী রহ. তাঁর কিতাব আস-সিয়ার আল-কাবিরে বলেছেন, "যদি একজন ব্যক্তি ১০০০ মুশরিককে আক্রমণ করে এবং এতে যদি সাফল্য বা শত্রুপক্ষের ক্ষতি করার ব্যাপারে আশাবাদী থাকে, তাহলে এমন আক্রমণ করার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আর যদি এমনটা না হয়, তাহলে এটা অপছন্দনীয়, কারণ সে মুসলিমদের কোন উপকার পৌঁছানো ছাড়াই নিজেকে মৃত্যুর মুখোমুখি করেছে। তবে যদি কারো নিয়্যত থাকে, মুসলিমদেরকে তাঁর কাজের অনুসরণে প্ররোচিত করা, তাহলে এর বৈধতাকে কল্পনাপ্রসূত বলা যায় না। কারণ এতে মুসলিমদের জন্যে নির্দিষ্ট কিছু দিক দিয়ে উপকার আছে। আর যদি তার নিয়্যত থাকে শত্রুদের আতংকিত করা এবং মুসলিমদের ঈমানী তেজ জাহির করা, তাহলে এর বৈধতা কল্পনাপ্রসূত নয়, যদি এতে দ্বীনের কল্যাণ থাকে।" (তাফসীরে কুরতুবী (৩৬৪/২)

দ্বীনকে শক্তিশালী করার জন্য এবং অবিশ্বাসীদের দুর্বল করার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করা একটি মহৎ কাজ, যার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর কালামে তাঁর মু'মিন বান্দাদের ব্যাপারে প্রশংসা করেছেন-

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ... (التوبة: ١١١)

অনুবাদ: "আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।..." (সূরা তাওবা-১১১)

মালিকি মাযহাবের একজন আলেম ইবন আল খুওয়াইজ মিক্কদাদ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ১০০ জন বা সেনাদলের একটি ইউনিট, অথবা একদল চোর ও যোদ্ধাদের আক্রমণ করে, অথবা খাওয়ারিজদের আক্রমণ করে, তাহলে এখানে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে: "যদি সে জানে যে সে যাদেরকে আক্রমণ করছে, তাদেরকে মেরে ফেলতে পারার সম্ভাবনা রয়েছে এবং নিজে বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাহলে এটা ভাল। আর যদি সে জানে যে তার মারা যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি কিন্তু সে অনেক

ক্ষয়ক্ষতি সাধন করতে পারবে (শত্রুদের) অথবা মুসলিমদের উল্লেখযোগ্য উপকার হবে, তাহলে এটাও জায়েজ।” (তাফসীরে কুরতুবী (৩৬৩/২)

শাফিঈ মাযহাবে, ইমাম ইবনে হাজার আসক্কালানী রহ. বলেছেন, “একজন লোকের অপেক্ষাকৃত বড় একটি শত্রুদলকে আক্রমণের ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, যদি এটা সাহসিকতা দেখিয়ে শত্রুকে আতংকিত করার জন্য এবং মুসলিমদের শত্রুর বিরুদ্ধে উৎসাহিত করার জন্য বা এই প্রকৃতির কোন নিয়্যত থাকে, তাহলে এটা ভাল। আর যদি এটা শুধুমাত্র তাড়াহুড়া করে করা হয়, তাহলে এটা জায়েজ নয়, বিশেষ করে যদি এতে মুসলিমদের দুর্বলতা সৃষ্টি হয়।” (ফাতহুল বারী (৪/১৮৫-১৮৬)

হাম্বালী মাযহাবে, ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেছেন, “চার মাযহাবের আলেমরা ঘোষণা করেছেন যে, মুশরিকদের দলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া জায়েজ, যদিও এটাই সম্ভাব্য হয় যে, তারা তাকে মেরে ফেলবে, যদি এতে মুসলিমদের উল্লেখযোগ্য উপকার থাকে। (ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ (২৮/৫৪০)

এই দলীলগুলো থেকে এটা পরিষ্কার যে, “শহীদি অভিযান” শরীয়তি দলীল দ্বারা সমর্থিত। এটা আল্লাহর তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের একটি বড় উপায়। যেমনটা আলেমরা উল্লেখ করেছেন, যদি উম্মাহর জন্য এতে যথেষ্ট উপকার থাকে, তবে “শহীদি অভিযান” চালানো যেতে পারে। মুজাহিদরা অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে এই কৌশল ব্যবহার করেছেন। আফগানিস্তান থেকে শুরু করে ইরাক এবং সব মাযহাবের সমসাময়িক আলেমরা এটার জায়েজ হওয়ার বিধানের ব্যাপারে নিশ্চিত করেছেন।

সমসাময়িক ফতোয়াসমূহ

এখানে আমরা শহীদি অভিযানের ব্যাপারে কিছু সমসাময়িক আলেমদের বক্তব্য উদ্ধৃত করব।

এ ব্যাপারে লিখিত সর্বোত্তম কিতাবগুলোর একটি **“ইসলাম এবং শহীদি অভিযান”**-এর লেখক ভারত উপমহাদেশের মুফতি আবূ বাশার আল-ক্বাসমি (হাফিযাহুল্লাহ) লিখেছেন, “(আসহাবে উখদূদের ঘটনা থেকে) আমরা জানতে পেরেছি যে, বালকটি রাজাকে নির্দেশ দেয়ার মাধ্যমে নিজের মৃত্যুর ব্যবস্থা করেছিল। যদি সে রাজাকে নির্দেশ না দিত বা তাকে মারার উপায় না জানাতো, তাহলে রাজার পক্ষে তাকে মারা সম্ভব ছিল না। এটা থেকে পরিষ্কারভাবে এটা জানা যাচ্ছে যে, অন্যের দ্বারা নিজেকে হত্যা করা অনুমোদিত, যদি এটা আল্লাহর কালিমাকে সুউচ্চ করার উদ্দেশ্যে হয়। একইভাবে দ্বীনের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে নিজেকে হত্যা করা অনুমোদিত। ঠিক যেমনটা আসহাবে উখদূদের লোকেরা

নিজেরাই নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছায় আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল। এমনকি যে নারী ঝাঁপ দিতে ইতস্তত করছিল, তাঁর শিশু সন্তান তাকে সাহস যোগানোর জন্য আল্লাহর ইচ্ছায় কথা বলে উঠেছিল, **"হে আমার মা! ধৈর্যধারণ ধরুন, কারণ আপনি সত্যের উপর আছেন!"** এরপর, সেই নারী আগুনে ঝাঁপ দেন এবং শহীদের মর্যাদা লাভ করেন। অনুরূপভাবে কেউ অন্যের হাতে নিহত হলেও এতে কোন পার্থক্য নেই। উদাহরণস্বরূপ, একজন একক ব্যক্তি একটি বড় সেনাদলকে একাই আক্রমণ করা। এই ধরনের সব লোকেরাই শহীদ, প্রশংসার পাত্র....তাদের সবাই প্রশংসিত। কারণ, তারা এই "আত্মঘাতী" হামলাগুলো করেছিলেন দ্বীনের উপকার ও একে সুউচ্চ করার জন্য। আর যা কিছুই দ্বীনের উপকারের জন্য এবং ইসলামকে সুউচ্চ করার জন্য করা হবে, সেটা উত্তম কাজ বলে বিবেচিত হবে। এখান থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, যদি কেউ দ্বীনকে সুউচ্চ করার জন্যে নিজেকে হত্যা করে, অথবা সে কাফিরদের দলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তারা তাকে হত্যা করে, অথবা যদি সে দ্বীনের উপকারের জন্যে অন্য কাউকে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেয় ... এই সবগুলোর জন্য একই হুকুম। এগুলোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তারা সবাই শহীদ ..." আরেক জায়গায়, তিনি কিছু দলীল উদ্ধৃত করে লিখেছেন, **"এ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, যেইসব লোক আল্লাহর আনুগত্যে এবং জিহাদে শহীদি অভিযান চালায় এবং ফলস্বরূপ নিহত হয়, তাহলে তারা শহীদ। তাদের শাহাদাতের ব্যাপারে বা তাদের জান্নাতে প্রবেশের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা পুরোপুরিভাবে অন্যায়। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যবানে তাদের শাহাদাতের ব্যাপারে সাক্ষ্য আছে, সেখানে তাঁর উম্মাতের কারো এই অধিকার নেই যে, সে এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে।"** **("ইসলাম এবং শহীদি অভিযান" পৃঃ ১৬৮)**

জাজিরাতুল আরবের শাইখ সুলাইমান আল-উলওয়ান (হাফিযাহুল্লাহ) লিখেছেন, "আর বর্তমানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, মুসলিমরা ইহুদীদের সাথে (সমানতালে) যুদ্ধ করতে এবং তাদের ধ্বংস করতে এবং পবিত্র ভূমি থেকে তাদের বহিষ্কার করতে পারছে না, সেক্ষেত্রে বানর ও শুকরদের ভাইদের (ইহুদীদের) জন্য সবচাইতে ভাল ঔষধ হল: আমরা তাদের বিরুদ্ধে শহীদি অভিযান চালাব এবং ঈমানী জযবা বৃদ্ধির জন্য ও অন্যান্য প্রশংসনীয় লক্ষ্যে যেমন কাফিরদের অন্তরে আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য, তাদের শারীরিক ও সম্পদসংশ্লিষ্ট ক্ষতি করার জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করব।"

এরপর তিনি (হাফিযাহুল্লাহ) আসহাবে উখদূদের ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেন,

"এতে আল্লাহর পথে মুজাহিদদের ইহুদী, খৃস্টান ও যমিনে অনাচার সৃষ্টিকারীদের বিপক্ষে পরিচালিত শহীদি অভিযানের পক্ষে দলীল রয়েছে।"

(The Islamic Ruling on the Permissibility of Self-Sacrificial Operations: পৃঃ ৫৩-৫৪)

আক্বলী বা যুক্তিভিত্তিক দলীল

একজন মুসলিমের জন্য কুরআন ও সুন্নাহর দলীলই যেকোন বিষয়ে হালাল-হারাম নির্ধারণের জন্য, অন্তরের সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ দূর করার জন্য যথেষ্ট। একটা বিষয় অনুমোদিত অথবা নিষিদ্ধ হওয়া নির্ধারিত হওয়ার জন্য আল্লাহর কালাম এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ এর কথাই শেষ কথা। তবে কুরআন ও সুন্নাহ এর সাথে সামঞ্জস্যশীল যুক্তিনির্ভর দলীল দেওয়ার ব্যাপারেও শরীয়তে অনুমোদন রয়েছে।

সেজন্য এবার আমরা একটি যৌক্তিক গবেষণাধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুজাহিদদের পরিচালিত "শহীদি অভিযান"কে পর্যবেক্ষন করব। যদি বলা হয়, ইসলাম ও কুফরের মধ্যকার বর্তমান যুদ্ধ একতরফা (দুনিয়াবি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে), তাহলে কমই বলা হবে। একদলে আছে ৪০ এর অধিক NATO এর অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্র এবং তাদের ভারি আকাশ, স্থল ও নৌ অস্ত্র স্থাপনা, সাম্প্রতিক নতুন গ্যাজেট এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। তাদের আছে বি-৫২, ডেইজি কাটার (বোম্বিং যন্ত্রাংশ) এবং অ্যাপাশি (যুদ্ধবিমান), যা অল্প সময়ের মাঝেই পূর্ণাঙ্গ এক একটি জনপদ ধ্বংস করতে সক্ষম, সাথে আছে সেনাদল, যাদেরকে সংখ্যায় টক্কর দেয়া দৃশ্যত অসম্ভব। তাদের হাতে আছে পরমাণু বোমা, যা মানুষের এক একটি প্রজন্ম সমূলে ধ্বংস করতে পারে। এদের নেতৃত্বে আছে এমন একটি দেশ, যার সামরিক খাতে খরচ, একই গ্রহের অন্য অনেক দেশের সম্পূর্ণ বাজেটের চাইতেও বেশি।

এছাড়াও এই ৪০+ দেশের সাথে আছে তাদের নির্ভরযোগ্য মিত্র, তথাকথিত "মুসলিম" দেশগুলোর মুরতাদ নেতৃবৃন্দ এবং তাদের সমস্ত সেনাদল, প্রযুক্তি ও ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি। আর অন্য দলে আছে ছাপোষা, সহজ-সরল কিছু মানুষ, যাদের হাতে কোন দেশের নিয়ন্ত্রনভার নেই। তাদের না আছে বিপুল পরিমাণ ভূমিসম্পদের উপর কর্তৃত্ব, না আছে উল্লেখযোগ্য আয়তনের কোন ভূমির রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ক্ষমতা। তাদের অস্ত্রশস্ত্র খুবই সাধারণ–ছোটখাট আগ্নেয়াস্ত্র, ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (IED), আর সীমিত কিছু ভারী অস্ত্র। তাদের আয়ের উৎস হল তাদের দ্বীনি

ভাইদের দেয়া দান- সাদাকা আর যুদ্ধপ্রাপ্ত গণিমত। তাদের সংখ্যা সীমিত, তাদের বাসস্থান পাহাড়ে আর যুদ্ধকৌশল–গেরিলা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের পক্ষে... আর বিজয় তো তাদেরই জন্য। কারণ তারা সেই সত্তার অবাধ্যতায় লিপ্ত হয় না, যার হাতে আসমান ও যমিনের রাজত্ব।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ (محمد: ٣)

অনুবাদ: "এটা এ কারণে যে, যারা কাফের, তারা বাতিলের অনুসরণ করে এবং যারা বিশ্বাসী, তারা তাদের পালনকর্তার নিকট থেকে আগত সত্যের অনুসরণ করে। এমনিভাবে আল্লাহ মানুষের জন্যে তাদের দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন।" (সূরা মুহাম্মাদ-৩)

নম্র/বিনয়ীরা হল সৌভাগ্যশালী, তারাই যমিনে কর্তৃত্বশালী হবে কিন্তু তারা এই বিজয় অর্জন করার জন্য কি উপায় অবলম্বন করবে?

শহীদি অভিযানের সত্যতা হল, তা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। একজন মুজাহিদ তার শরীরে বেঁধে বা গাড়িতে করে বিস্ফোরক নিয়ে তা বিপুল সংখ্যক শত্রুর মাঝে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে, ফলে একটি মাত্র প্রাণের বদলে শত্রুর বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়।

যে আমেরিকানরা ২০০১ এর পর থেকে নিরীহ আফগানদের উপর শক্তি/ দাপট দেখিয়ে আসছিল, তাদেরকেই এখন দেখা যায়, আলোচনায় বসার চেষ্টা করতে, এই যুদ্ধ থেকে বের হওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করতে। ৯/১১ এর প্রভাব এর সাক্ষ্য দেয় ! ১৯ জন দৃঢ়চিত্ত মানুষ একটি অসাধারণ প্রচেষ্টায় ইতিহাসের স্রোতের দিক পরিবর্তনে সক্ষম হয়। এটা মূলত: কাফিরদের অর্থনীতির অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছে এবং বছরের পর বছর ধরে পরিকল্পিত তাদের পৃথিবীব্যাপী উপনিবেশ স্থাপন প্রচেষ্টা পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে... এরপর ইরাকের যুদ্ধে শাইখ আবূ মুসআব আল জারকাবী রহ. এর নেতৃত্বে শহীদি অভিযানের মাধ্যমে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। বলা হয়ে থাকে, যখন আমেরিকান সেনারা শুনতে পায় যে, তারা ইরাকে যাচ্ছে আবূ মুসআব আল-কারজাবীর মুখোমুখি হতে, তখন ভয়ে তাদের শরীরে কাঁপন ধরে যায়! একই অবস্থা হয়েছে আফগানিস্তানে মোল্লা দাদুল্লাহ রহ. এর নেতৃত্বে শহীদি অভিযানের মাধ্যমে। বাস্তবতা হল, যেমনটা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, কাফির বিশ্বে মুসলিমদের এই অস্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মত কোন কিছু নেই।

শহীদি অভিযানের বিরুদ্ধে সকল রকম মিথ্যা প্রচারণা আসলে একটি প্রহসন। কারণ এর যৌক্তিকতা শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত। পৃথিবীর মুসলিমদের মিডিয়া বা জনমতের দিকে তাকানো উচিৎ নয়,

বরং কোন কাজের যৌক্তিকতার মানদণ্ড নির্বাচন করতে তাকাবে শরীয়তের দিকে– উজ্জ্বল, সুস্পষ্ট শরীয়ত, যা তাদের ইহকাল ও পরকালের মুক্তির আলো ধারণ করে থাকে।

সুতরাং শেষকথা হিসেবে বলা যেতে পারে, "আত্মঘাতী বোমা-হামলা" পরিভাষাটি ত্রুটিপূর্ণ। বরং "শহীদি অভিযান" হল শরীয়তে সর্বোচ্চমাত্রায় প্রশংসিত আমলগুলোর একটি, যখন তা পরিচালনা করা হয় অবস্থার প্রয়োজনভেদে, হক্কানী আলেম ও মুজাহিদদের বিবেচনা অনুযায়ী। আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তিনি যেন আমাদের সবাইকে সত্যকে সত্য হিসেবে দেখার ও তার উপর চলার তৌফিক দান করেন এবং মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবে চেনার ও তা থেকে দূরে থাকার তৌফিক দান করেন...! (আল্লাহুম্মা আমীন)

(আপনাদের নেক দু'আয় মুজাহিদীনে কেরামকে ভুলবেন না।)

وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.